তৃতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি সান্দর্ভিক বিশ্লেষণ

১১৯২ সালে মহম্মদ ঘুরীর হাত ধরে ভারতবর্ষে যে নতুন শাসনব্যবস্থার পত্তন হয় তা ছিল অনেকদিক থেকেই পূর্বতন ব্যবস্থার তুলনায় পৃথক। বস্তুত এইভাবে যে মুসলিম রাজত্বের সূচনা ঘটে তা মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক সুদূরপ্রসারী ফলাফলের সৃষ্টি করে এবং ১৭৫৭ সালে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই মুসলিম শাসনের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। সব থেকে বড়ো কথা হল যে ভারত ইতিহাসে যাকে আমরা মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত করি, তার সময়কাল সাধারণভাবে ১২০৬ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ মুসলিম শাসনের সূচনা থেকে সমাপ্তি এই পুরো সময়কেই সাধারণ অর্থে মধ্যযুগ বলে আমরা গণ্য করে থাকি। ভারত ইতিহাসে এই মধ্যযুগ যা এক নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায় তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাতেও নতুন কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দেয় যা তৎকালীন ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ছিল সম্পূর্ণভাবেই অপরিচিত। এর কারণ সম্ভবত ছিল এই যে, যাদের হাত ধরে মধ্যযুগে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল বা পত্তন হয়েছিল তাঁরা ছিলেন ভিনদেশি এবং সম্পূর্ণ পৃথক সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক। ফলস্বরূপ মধ্যযুগে ভারতে যে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে তা ছিল চরিত্রগত ভাবে এক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং পরিবর্তিত সামাজিক কাঠামোকে যদি আমাদের বুঝতে হয় তাহলে এই শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি বাস্তব থেকে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে। আবার এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। তা হল যে, যখন আমরা মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করব তখন এটা স্মরণে রাখতে হবে যে এই সময়ে যে রাষ্ট্র ও শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছিল তা কিন্তু সর্বাবস্থায় এবং সকল সময়ে একরকম ছিল না। যদি সুলতানি আমলের দিকে আমরা চোখ ফেরাই তা হলে দেখা যাবে যে দাস বংশের শাসনকালে যে ধরনের নীতি বা তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীকালে খলজি শাসনকালে সেসকল ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। আবার যখন আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শে আরও একবার পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। তবে বোধ হয় সবথেকে বেশি অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় মুঘল যুগে। বস্তুত সুলতানি আমলে যে সকল রীতি-নীতিকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় মণ্ডিত করা হয়েছিল, মুঘল আমলে সেই সকল নীতির অনেকগুলিকে গুরুত্বহীন তো করা হলই, এমনকি বেশ কিছু নতুন আদর্শ বা তত্ত্বকে তুলে ধরা হল যা মধ্যযুগের সুলতানি শাসনের নিরিখে একেবারেই বিপরীত। সুতরাং মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা এটা যেন ভুলে না যাই যে এই যুগে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা বিভিন্ন সময়ে শাসকের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ এবং কাঠামোকে বদল করেছে এবং যার ফলে অবধারিত ভাবেই রাষ্ট্রব্যবস্থার নীতি এবং আদর্শেরও পরিবর্তন

Oxford University Press

শ্রেণির ক্ষমতারও পুনর্বিন্যাস হত। এখানে আরও একটি বিষয় মনে রাখার মতো, তা হল যেহেতু সম্রাট বা শাসকের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এই অভিজাত শ্রেণির আনুগত্য ও সমর্থনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল, সেই কারণে অনেক সময়েই মধ্যযুগের মুসলিম শাসকরা নিজেদেরকে ইসলামের রক্ষাকর্তা বা ইসলামের প্রতিভূ বলে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বিবিধ, একদিক থেকে নিজেকে ধর্মের রক্ষাকর্তা রূপে তুলে ধরার ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সমর্থন লাভ করা অনেক সহজ হত এবং এর ফলে অভিজাত শ্রেণিও এই জনসমর্থনের চাপে শাসকের প্রতি আনুগত্য দেখাতে বাধ্য হতেন। আবার ইসলামে যেহেতু ধর্মগুরু বা খলিফার স্থান ছিল সর্বোচ্চ, যাকে এমনকি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষও স্বীকার করতে বাধ্য থাকতেন। ফলে নিজেকে ইসলামের রক্ষাকর্তা বা হজরত মহম্মদের প্রচারক রূপে তুলে ধরে মধ্যযুগের শাসকরা খলিফার অনুমোদন আদায় করতেন। এই অনুমোদনকে অস্বীকার করে শাসকের বিরোধিতা করা অভিজাত শ্রেণির পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হত না।

দুই

এখানে যে প্রশ্নটি অবশ্যম্ভাবী তা হল যে মধ্যযুগে ইসলামি শাসনের কালে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা কি ধর্মীয় না আধুনিক রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো উপস্থিতি সেখানে ছিল? মধ্যযুগের ইউরোপের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল যে রাজা বা রাজ্যের শাসক যে ধর্মীয় মতাবলম্বী হতেন, রাজার সেই ব্যক্তিগত ধর্মবিন্যাসে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে পরিচালিত হত। আমরা জানি যে সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম প্রচলিত ব্যবস্থার সপক্ষে একটি অনুমোদন রূপে কাজ করেছিল। অর্থাৎ ধর্ম সরাসরি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে থেকে তাঁর বৈধতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ফলে শাসক নিজেকে ধর্মের রক্ষক বা প্রতিভূ রূপে হাজির করতেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিজ ধর্ম বিশ্বাসকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূপে ঘোষণা করতেন। ইউরোপে প্রোটেস্ট্যান্ট মতের আবির্ভাবের ফলস্বরূপে যে ত্রিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল তা শেষপর্যন্ত যে নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে তাহল যে রাজা বা শাসকের ধর্মই রাজ্যের ধর্ম রূপে পরিচিত হবে। এরফলে ইউরোপে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় সেখানে রাজার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের বাইরে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হতেন। যেমন ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে ঘোষণা করা হয় যে রাজা বা রানির ব্যক্তিগত ধর্মবিন্যাস-ই রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে বিবেচিত হবে। অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে যখন তাঁর সঙ্গে পোপের বিরোধ বাধে তখন ইংল্যান্ডে বসবাসকারী রোমান ক্যাথলিকদের নানাধরনের অত্যাচার সহ্য করতে হয়। একইরকমভাবে তাঁর কন্যা রানি মেরির রাজত্বকালে এর উলটো ঘটনা ঘটে। যেহেতু রানি মেরি ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ফলে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রধর্ম সেই অনুসারে পরিবর্তিত হয় এবং এ যাত্রায় প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বীরা নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। আবার রানি এলিজাবেথের শাসনকালে রানির ধর্মবিশ্বাসের হাত ধরে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত পুনরায় রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। তবে শুধুমাত্র ইউরোপেই যে ঘটনা ঘটেছিল তা নয় এশিয়াতেও কোনো না কোনো রূপে এই রকম বিধি-ব্যবস্থার হদিশ আমরা পাই। এমনকি বিংশ

February 2020 : 14:44:47: Copyright : Vidyasagar

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের অন্তর্ভুক্ত যে সকল দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল সেখানে সংশ্লিষ্ট রাজ্য মুসলিম রাজ্য বলে বিবেচিত হত যদি তাঁর শাসক ইসলাম ধর্মাবলম্বী হতেন, আবার শাসক হিন্দু হলে সেই রাজ্য হিন্দু রাজ্য বলে চিহ্নিত হত। এই প্রসঙ্গে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের কথা বলা যায় যা সেই সময় মুসলিম রাজ্য রূপে পরিচিত হত যেমন এই রাজ্যের শাসক বা নিজাম ছিলেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী, যদিও জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ ছিল হিন্দু। সাধারণভাবে এই ধারণাই পোষণ করা হত যে শাসক তাঁর নিজ ধর্মের নীতি ও অনুশাসন মেনে চলবেন এবং নিজ রাজ্যের সর্বত্র এই ধর্মীয় অনুশাসন ও নীতির বাস্তবায়ন ঘটাবেন।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মধ্যযুগে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন সুলতানি শাসনের সূত্রপাত হয়েছিল সেখানে উলেমা এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী অন্যান্য শ্রেণির তরফ থেকে এই আশঙ্কাই ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, যেহেতু সুলতান নিজে মুসলমান, সেহেতু তাঁর শাসন ইসলামি নীতি, নির্দেশ এবং ধ্যানধারণা অনুসারে পরিচালিত হবে। এটা সত্য যে ইসলামি নীতি বা ইসলামি আইন যেভাবে বিবর্তিত হয়েছিল সেখানে সম্প্রদায়গতভাবে বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন মুসলিম। অর্থাৎ ইসলামি আইনে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো ছিল না সেখানে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অমুসলিম অথচ শাসক মুসলিম ধর্মাবলম্বী। এক্ষেত্রে আরও একটি সত্য হল যে, যে সকল রাষ্ট্রেও শাসক এবং প্রজা উভয়েই ইসলাম ধর্মাবলম্বী সেখানেও কিন্তু ইসলামি শরিয়ত আইন সম্পূর্ণ রূপে বলবৎ করা সম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে ইউরোপে যে পরিপ্রেক্ষিতে শাসকের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস রাষ্ট্রের ধর্ম বলে পরিগণিত হয়েছিল সেখানে ধর্মীয় পার্থক্য নয়, বরং ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের প্রশ্নে মূল বিরোধ সংগঠিত হয়েছিল। আসলে ইউরোপে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট যে বিরোধ তা ইসলামি দুনিয়ার শিয়া-সুন্নি বিরোধের অনুরূপ, তা কখনোই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মূল ধর্মীয় পার্থক্যকে নির্দেশ করে না। ভারতবর্ষের মতো দেশে যেহেতু জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ পৃথক ধর্মাবলম্বী সেখানে মুষ্টিমেয় শাসকের ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূপে কীভাবে পরিগণিত হতে পারে সেটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এমন একটা সময় পর্যন্ত ইসলাম শাসক শ্রেণির সংগঠিত বিধানের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। শাসকও তাঁর অভিজাত শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এবং রাজা ও অভিজাত শ্রেণির স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানের প্রশ্নে ইসলামের ধর্মীয় রীতিনীতিকে প্রয়োগ করতেন। এবং এই কারণে শাসককেও এমন কিছু বাহ্যিক আচরণ প্রদর্শন করতে হত যার উদ্দেশ্য ছিল নিজ সম্প্রদায়ের কাছে নিজের ধর্মীয় অবস্থাকে তুলে ধরা এবং সমর্থন নিশ্চিত করা। এই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার বাইরে সুলতানি আমলে শাসকগণ শরিয়তকে মানা করার ক্ষেত্রে তেমন একটা আগ্রহ দেখাতেন না, তার কারণ ছিল এই শরিয়ত আইন শাসকের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বের নিরিখে অনেক ক্ষেত্রেই বাধাস্বরূপ বলে বিবেচিত হত।

কিন্তু এই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার বাইরেও মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় রাষ্ট্রের চরিত্রকে তুলে ধরে। বস্তুত মধ্যযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় উলেমা বা ধর্মতত্ত্ববিদদের যে প্রাধান্য ছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয় রাষ্ট্রের ধারণাকে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে অনেকে গণ্য করেন। যেহেতু রাষ্ট্রপরিচালনার প্রশ্নে উলেমাদের প্রাধান্যমূলক ভূমিকা ছিল, ফলে তাঁরা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য রূপে মূলত ধর্মীয় নীতিকে বাস্তবায়িত করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং সুলতানি শাসনব্যবস্থায় যে তিনটে ধর্মীয় নীতিকে বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হত, তা হল : এক, অবিশ্বাসীদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা ; দুই, অমুসলমানদের বিনাশসাধন এবং তিন, পৌত্তলিকতার অবসান। মধ্যযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় উলেমাদের এই ভূমিকা অবশ্যই ধর্মীয় রাষ্ট্রের পরিচয় দ্যোতক। এই প্রসঙ্গে ড. ঈশ্বরী প্রসাদের বক্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁর মতে দিল্লির তুর্কো-আফগান সুলতানরা নিজেদের ইসলামীয় জগতের অবিচ্ছিন্ন অংশ বলে মনে করতেন এবং ইসলামীয় বিধান অনুযায়ী তাঁরা খলিফাকে নিজেদের প্রভুরূপে গণ্য করতেন। আবার ইসলামীয় আইনবিধি বা শরিয়ত ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি। এই বিধি অনুযায়ী অমুসলমানদের 'জিজিয়া' কর দিতে বাধ্য করা হত। প্রজা বা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে করব্যবস্থার এই বৈষম্য ধর্মীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই সম্ভব। ঈশ্বরী প্রসাদের বক্তব্য অনুসারে অমুসলমান ব্যক্তিবর্গকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রেও তৎকালীন মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রযন্ত্রকে যথেষ্টভাবে ব্যবহার করা হত। বস্তুত ড. ঈশ্বরী প্রসাদ মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধর্মীয় রাষ্ট্রের বাইরে অন্য কিছু ভাবতে পারেননি। কিন্তু সুলতানি যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থার ধর্মীয় চরিত্রকে যেভাবে ড. ঈশ্বরী প্রসাদ তুলে ধরেছেন মুঘল যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি সেভাবে আলোকপাত করেননি। অথচ মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল মুঘল যুগ এবং এই মুঘল রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল অনেকাংশেই পূর্বতন সুলতানি ব্যবস্থার তুলনায় গুণগতভাবে পৃথক।

যদিও মুঘল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইসলামীয় রীতিনীতিকে উচ্চস্তরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সুলতানি আমলের নিরিখে এইক্ষেত্রে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যেখানে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধ্যানধারণার আভাস পাওয়া যায়। বস্তুত কোরান এবং শরিয়তকে মানা করে চললেও তার কঠোর প্রয়োগ মুঘল আমলে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হত। মুঘল শাসকরা এই বিষয়ে এক প্রকার নিশ্চিত ছিলেন যেহেতু এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী নয় ফলে শরিয়ত এবং কোরানের যথাযথ প্রয়োগ সাফল্য লাভ করবে না। বরং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণকে কীভাবে সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত করে তোলা যায় সে বিষয়েই মুঘল সম্রাটরা বিভিন্ন বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এখানে আরও একটি বিষয় হল যে মুঘল সাম্রাজ্য ছিল সুলতানি আমলের তুলনায় অনেক বেশি সুসংগঠিত এবং তার ভিত্তি ছিল সুদৃঢ় ফলে কোরান বা শরিয়তকে মানা করে চলার ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের বাধ্যবাধকতা থাকত না। ঔরঙ্গজেবের আমল থেকে যখনই সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয় তখনই মুঘল শাসকরা সাম্রাজ্যের

বৈধতা হেতু ইসলামীয় রীতিনীতিকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরতে লাগলেন। অর্থাৎ জাহাঙ্গিরের সময়কাল থেকে যতদিন মুঘল সাম্রাজ্য একটি কেন্দ্রীভূত, স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা রূপে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল ততদিন মুঘল রাজদরবারে উলেমা বা ওমরাহ শ্রেণির প্রতিপত্তি অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। যদিও আকবরের গৃহীত ধর্মনীতির উপর ভিত্তি করে যে শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাঁকে সর্বাংশে আধুনিক কালের মতো ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা বলা যায় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রজাসাধারণকে মানসিকভাবে যুক্ত করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রচেষ্টা কিন্তু সুলতানি আমলে বড়ো একটা পরিলক্ষিত হয় না এবং মুঘল শাসনব্যবস্থার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগের ভারতে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈধতা সম্পর্কিত একটি নতুন দিককে আমাদের সামনে হাজির করে।

অবশ্য সুলতানি শাসনব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করে অনেকে এরকম মত পোষণ করেন যে এই সময় শরিয়তের সমস্ত নীতি নির্দেশকে কার্যকর করা হয়েছে তবে এই ধারণা অনেকাংশে ভুল। যেমন ইসলামিক রাষ্ট্রে পৌত্তলিকদের অধিকার অস্বীকৃত এবং শরিয়তি নিয়ম মানলে তৎকালীন ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর কোনো অধিকার থাকার কথা নয়। কিন্তু এই বিধান কখনও কার্যকর হয়নি। আবার সুলতানি শাসন ব্যবস্থায় হিন্দু কর্মচারীদের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট, এমনকি রাজস্ব বিভাগে হিন্দু কর্মচারীদের প্রাধান্য ছিল চোখে পড়ার মতো। শরিয়তি বিধানকে মান্য করলে সুদ গ্রহণ করা যায় না কিন্তু সুলতানি আমলে ঋণদান করা এবং সুদ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হয়নি। সুলতানি রাষ্ট্রব্যবস্থার ধর্মীয় চরিত্রকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনেকে জিজিয়া করের প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে যেটা মনে রাখা দরকার তা হল যে মহিলা, শিশু, প্রকৃত অসহায় ব্যক্তিদের এই করের থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হত। এই প্রসঙ্গে ড. আশরফের বক্তব্যকে আমরা স্মরণ করতে পারি। *হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবন-চর্যা* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি এই প্রসঙ্গে যে দীর্ঘ বক্তব্য হাজির করেছেন তা হল : সুলতানরা ইসলামের ধর্মীয় সুবিদিত বিধি লঙ্ঘন করে চলতেন, যথা, বাদশাহ নির্বাচনের নীতি, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির সংজ্ঞা নির্ধারণ করে রচিত উত্তরাধিকারের আইন ও এই সম্পত্তির অংশ বণ্টনের নীতি এবং ইসলাম অনুমোদিত কাজ (হালাল) ও ইসলাম-নিষিদ্ধ কাজের (হারাম) মধ্যে প্রভেদ নির্ণয়ের নীতি—এইসব নীতির ক্ষেত্রে সুলতানরা তাঁদের ইচ্ছা ও সুবিধামতো কাজ করতেন অর্থাৎ শরিয়ত নির্দিষ্ট পথে চলতেন না। সুলতানি রাজত্বের আইন-কানুন ইসলামি আইন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এক কথায়, সুলতানের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দই ছিল সুলতানি আমলে আইনের মূলকথা। আবার ঐতিহাসিকভাবে এই কথাও সত্যি যে সুলতানি সাম্রাজ্য মূলত সামরিক শক্তির জোরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত সামরিক শক্তির উপর সুলতানি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল ছিল। সুলতানরা সামরিক শক্তির ভিত্তিতেই রাজ্য জয় করতেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। এই অর্থে কোরান এবং শরিয়তের প্রতি দিল্লির সুলতানদের যে আনুগত্য তা ছিল মূলত রাজনৈতিক এবং মূলত সাম্রাজ্যের বৈধতা প্রতিষ্ঠা হেতু দিল্লির সুলতানি

... on 13 February 2020 14:44:47, Copyright

শাসকগণ ইসলামি বিধি-ব্যবস্থার প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করতেন। আবার সামাজিক ভাবে হিন্দুধর্ম তার অস্তিত্বকে অটুট রেখেছিল ফলে শহরাঞ্চলে মুসলমান অভিজাত গোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকলেও গ্রামাঞ্চলে চিরাচরিত হিন্দু অভিজাত গোষ্ঠী তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ফলে সুলতানি আমল এবং মুঘল শাসনাধীনে মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সঠিক চরিত্র ও প্রকৃতি নিয়ে বিবিধ পরস্পরবিরোধী মতামতের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়।

তিন

এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তি সংক্রান্ত আলোচনা করা যেতে পারে। বস্তুত আধুনিক যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান রূপে চিহ্নিত হয়। এক অর্থে আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং তার ক্ষমতার একটি প্রধান দিক হল তার সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করে আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র কেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। তবে এই প্রসঙ্গে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে এই সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি-শাসকের ক্ষমতা নয়। এই ক্ষমতা হল সমগ্র জাতির যার প্রতিনিধিত্ব করে রাষ্ট্র। এখন মধ্যযুগের ভারতে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা ছিল মূলত রাজতন্ত্রভিত্তিক এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয় সামরিক শক্তির ভিত্তিতে অথবা বংশানুক্রমিকভাবে রাজারা ক্ষমতায় আসীন হতেন। এখন প্রশ্ন হল এই রাজতন্ত্র শাসিত মধ্যযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের ধারণা কীভাবে বিকশিত হয়েছিল? আদৌ সার্বভৌমত্বের কোনো ধারণার অস্তিত্ব ছিল কিনা? রাজতন্ত্র ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটি মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার নিরিখে আরও একটি বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে সার্বভৌমত্বের ধারণা সর্বক্ষেত্রেই আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়েছিল যার ফলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের একটি ধারণা হিসেবে সার্বভৌমত্ব বিশেষ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

মধ্যযুগের ইউরোপে যে সামন্তব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল সেখানে চার্চ ছিল একটি প্রধান কর্তৃপক্ষ। নিজের কর্তৃত্বের সমর্থনে চার্চ যে তত্ত্ব গড়ে তুলেছিল তা হল, যেহেতু আধ্যাত্মিক জগৎ পার্থিব জগতের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর সেহেতু আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষ সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের ঊর্ধ্বে অবস্থান করবে। এই অর্থে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিনিধি রূপে ঊর্ধ্বে হলেও সর্বশক্তিমান এবং রাষ্ট্রের শাসক তথা রাজা হলেন পোপের অধীনস্থ। ফলে সাধারণভাবে আমরা যাকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বলে গণ্য করে থাকি সেই সার্বভৌমত্বের ধারণা মধ্যযুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাপেক্ষে অনুপস্থিত ছিল। আবার অন্যদিক থেকেও মধ্যযুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সার্বভৌমত্বের ধারণা গড়ে উঠার ক্ষেত্রে কিছু বাস্তবিক অসুবিধার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। মধ্যযুগের ইউরোপে ভূমিদাস ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যার শীর্ষে অবস্থান করতেন স্বয়ং সম্রাট কিন্তু অঞ্চলভেদে প্রতিটি অঞ্চলে সমস্ত প্রভুদের নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে কোনো কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব গড়ে ওঠেনি যা আমরা জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখতে পাই। যখনই ইউরোপে জাতিরাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনা হল ঠিক তখনই সার্বভৌমত্বের ধারণা তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের

অনুপস্থিতি-ই যেখানে সব থেকে বড়ো কারণ যার ফলে চার্চের পক্ষে নিজেকে ইউরোপের একমাত্র অভিভাবক রূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হয়েছিল। এখন ইসলামি দুনিয়ার দিকে তাকালে যেটা আমরা দেখি যে, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মহম্মদের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর জীবনাবসানের পর ইসলামীয় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় খলিফার উপর। ইসলামি জনগণকে শরিয়ত অনুসারে পরিচালনার ব্যাপারে দায়বদ্ধ ছিলেন এই খলিফা। লক্ষণীয় যে এইভাবে যে ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল সেখানে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভিত্তি, শক্তি ও সংগঠন হিসেবে ধর্মের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের ধর্মীয় দর্শন অনুসারে ঈশ্বর হলেন সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী এবং অবশ্যই তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রথমে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ইসলামীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সর্বোচ্চ পরিচালক হিসেবে 'খলিফা'-র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নিরিখে অন্যান্য মুসলমান শাসকরা হলেন খলিফার নায়েব স্বরূপ। তাঁদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। একভাবে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব অনুসারে খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রতিটি মুসলমানের তা সে রাজাই হোক বা সাধারণ মানুষ, পক্ষে বাধ্যতামূলক। যদিও খলিফাতন্ত্রকে একটি রাজনৈতিক সংগঠন রূপে দাবি করা হয় কিন্তু মূলত এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামের অস্তিত্বকে অব্যাহত রাখা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এবং আবশ্যিক ইসলামীয় ঐক্য সৃষ্টির ভিত্তি রূপে। অর্থাৎ এই খলিফাতন্ত্র এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা মূলত ধর্মীয় অনুশাসনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় পবিত্রতা এবং ধর্মীয় বিধিব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই খলিফাতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ রূপে নিজেকে তুলে ধরে। এইদিক থেকে ইউরোপের পোপতন্ত্রের সঙ্গে খলিফাতন্ত্রের অনেকাংশে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় দিল্লির অধিকাংশ সুলতান রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামীয় আদর্শকে অনুসরণ করতেন যা সমসাময়িক পরিস্থিতির সাপেক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। এই ইসলামীয় আদর্শকে অনুসরণ করেই তাঁরা খলিফাকে মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। এবং অনেক শাসকই সুলতান পদের স্বীকৃতির জন্য খলিফার স্বীকৃতি সূচক সনদ গ্রহণ করতেন। এই সনদের পরিপ্রেক্ষিতেই সুলতানেরা নিজেদের খলিফার প্রতিনিধি রূপে প্রতিপন্ন করতেন। অনেক সময়ে সুলতানেরা নিজেদের খলিফার সহকারী বা ইয়ামিন-উল-খলিফা হিসেবে প্রতিপন্ন করতেন। এমনকি খলিফার নামে 'খুতবা' পাঠ করতেন, এবং প্রচলিত মুদ্রার উপর খলিফার নাম উৎকীর্ণ করতেন। যদি ড. ত্রিপাঠীর বক্তব্যকে আমরা অনুসরণ করি তাহলে দেখব যে, মধ্যযুগের সুলতানি রাষ্ট্র ছিল প্রকৃতিগতভাবে ধর্মীয় বা পুরোহিত রাষ্ট্রিক। শরিয়তের যাবতীয় নির্দেশকে বাস্তবে কার্যকর করাই ছিল সুলতানি আমলের প্রতিষ্ঠানসমূহের একমাত্র লক্ষ্য। তবে এই বিষয়টিকে অন্যভাবেও ভাবা যেতে পারে, যেহেতু ভারতের মতো এমন একটি দেশে মুসলমান রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল যেখানে প্রজাসাধারণের অধিকাংশ ছিল অন্য ধর্মাবলম্বী ফলে বৃহত্তর ইসলামি জগতের সমর্থন লাভের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা ছিল সুলতানদের কাছে এক ধরনের বাধ্যবাধকতা। এইদিক থেকে সমসাময়িক ভারতের পরিস্থিতি ছিল

on 13 February 2020 14:44:47, Copyright

সমসাময়িক ইউরোপের তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। কেননা ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে ভারতের মতো শাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রজাসাধারণের কোনো ধর্মীয় পার্থক্য ছিল না। এই ধর্মীয় পার্থক্যের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই ধর্মীয় পার্থক্যই মধ্যযুগের ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলামি দুনিয়ার অন্যান্য অংশের তুলনায় স্বকীয়তা প্রদান করেছিল।

এই সূত্র ধরেই অনেকে একথা বলার চেষ্টা করেছেন যে মধ্যযুগে খলিফাতন্ত্রের প্রতি তুর্কো-আফগান সুলতানদের এই আনুগত্য প্রদর্শনের বিষয়টি যতটা না ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা, বরং অনেক বেশি রাজনৈতিক স্বার্থ সাধনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। অর্থাৎ খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিষয়টি তেমনভাবে ধর্মীয় আনুগত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। দিল্লির সুলতানদের মধ্যে অনেকেই আছেন যেমন আলাউদ্দিন খলজি, যাঁরা নিজ সামরিক তথা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন যদিও তাঁরা কোনো অবস্থাতেই খলিফার স্বীকৃতি অর্জন বা তাঁর প্রতি কোনো রকম আনুগত্য প্রদর্শনের চেষ্টা করেননি। বস্তুত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সুলতানদের কাছে একটি রাজনৈতিক বিষয় রূপে পরিগণিত হয়েছে এবং যখন কোনো শাসক ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ভেবেছেন সেখানেও নিজ শাসনব্যবস্থার ভিত্তিকে শক্ত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে যখন মুঘল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খলিফার পরিবর্তে মুঘল সম্রাটকে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে প্রচার করা হয়। যদি মুঘল বাদশাহকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে গণ্য করা হয় তাহলে তিনি কখনোই খলিফার অধীনস্থ থাকতে পারেন না। অর্থাৎ মুঘল আমলে খলিফাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে। সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে মুঘল আমলের ধ্যানধারণা অনেকটা চেঙ্গিস খানের সূত্র ধরে আবর্তিত হয়েছে। চেঙ্গিস খান নিজেকে ঈশ্বরীয় আদেশপ্রাপ্ত চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক হিসেবে গণ্য করতেন এবং পরবর্তীকালে তৈমুরের মধ্যেও সার্বভৌম ক্ষমতা বিষয়ক এইরকম অভিন্ন ধারণা বর্তমান ছিল। পরে বাবর যখন কাবুলের শাসক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি 'বাদশাহ' উপাধি ধারণ করেন। এইক্ষেত্রে আকবর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনিই প্রথম মুঘল সম্রাট যিনি সার্বভৌমত্বের ধারণাকে তুলে ধরেন যা পরবর্তীকালে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার নিরিখে সার্বভৌমত্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে গৃহীত হয়। এমনকি সার্বভৌম শাসক হিসেবে আকবর শরিয়তি আইন ব্যাখ্যা এবং আইন প্রণয়নের অধিকার উলেমাদের হাত থেকে নিজের হাতে নেন। ফলে উলেমা ও ধর্মতত্ত্ববিদগণ আগে যেভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতেন, তার প্রভাব অনেকাংশে হ্রাস পায়। তবে এই প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে মুঘল শাসনব্যবস্থা সুলতানি আমলের তুলনায় ব্যাপকতর জনভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সামরিক শক্তির নিরিখেও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে মুঘল শাসকরা যেভাবে তাঁদের সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই তাঁরা করতে পেরেছিলেন।

পরিশেষে একথা বলা কোনো ভাবেই অযৌক্তিক হবে না যে আধুনিক অর্থে যে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে আমরা রাষ্ট্রের কর্তব্য বৈধতা তথা সার্বভৌমিকতা নিয়ে আলোচনা করি তার উপস্থিতি মধ্যযুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক অর্থে ছিল না। রাষ্ট্রের বৈধতা বা সার্বভৌমিকতা প্রকৃতপক্ষে রাজার বৈধতা তথা কর্তৃত্ব রূপে পরিগণিত হত। এই কারণে ক্ষমতাসীন শাসকরা নিজেদের মতো করে বৈধতা অর্জন এবং নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতেন। তবে ইউরোপে যেভাবে রাজকীয় কর্তৃত্ব এবং পোপের মধ্যে বিরোধ সংগঠিত হয়েছিল এবং তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে টমাস অ্যাকুইনাস এবং সেন্ট অগাস্টাইন যেভাবে তাঁদের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণাকে তুলে ধরেছিলেন, এবং এর বিপরীতে মার্সিলিয়াস-এর মতো লেখক রাজকীয় কর্তৃত্বের স্বপক্ষে কলম ধরেছিলেন, সেরকম ধরনের বিতর্ক মধ্যযুগের ভারতে দেখা যায় না। মধ্যযুগের ভারতে যে সকল ব্যক্তি সেই সময়ের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁরা কিন্তু রাজকীয় কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি জানালেও ধর্মের ভূমিকাকে সর্বদাই উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। একভাবে মধ্যযুগের ভারতে ধর্মের অনুষঙ্গকে বাদ দিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কল্পনা করা হয়নি। প্রকৃত পক্ষে ইসলামি ধ্যানধারণার পরিমণ্ডলে থেকে বিভিন্ন চিন্তাবিদ রাজার কর্তব্য বৈধতা তথা সার্বভৌমত্বকে বিচার বিশ্লেষণ করেছিলেন। এইদিক থেকে বিচার করলে মধ্যযুগের ইউরোপের তুলনায় মধ্যযুগের ভারত অনেকখানিই আলাদা।

তথ্যসূত্র

১. S. Nurul Hasan, *Religion, State and Society in Medieval India.*
২. Wm. Theodoxe de. Bary (Ed.) *Sources of Indian Tradition,*
৩. M. Athar Ali, *Mughal India,*
৪. Irfan Habib, *Agrarian System of Mughal India.*
৫. Muzaffar Alan, *The Crisis of Empire in Mughal North India.*
৬. Satish Chandra, *Medieval India.*
৭. R. S. Sharma, *Indian Feudalism.*
৮. R. C. Majumdar, *Preface to History and Culture of Indian People.*
৯. Tara Chand, *Influence of Islam on Indian Culture.*
১০. Ishwai Prasad, *History of Quraunah Turks in India.*